শোকাবহ আগস্ট ■ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

বাঙালির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

শেখ মুজিবের অবদান কতটুকু

বায়ান্তর সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি; এখন তা সাড়ে ষোলো কোটি। পরিসংখ্যানে সকল সত্য নির্ভুলভাবে হয়তো জানান দেয় না। তবে এ ক্ষেত্রে বিকল্প বিহনে এর ওপর নির্ভর করে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বায়ান্তর থেকে পনেরো : মাথাপিছু আয় সত্তর মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে তেরোশ চল্লিশ, গড় আয়ু তেতাল্লিশ থেকে বেড়ে একাত্তর বছর, শিশু মৃত্যুর হার হাজারে একশ সত্তর থেকে বত্রিশ, নারীর মোট প্রজনন প্রবণতা পাঁচ থেকে নেমেছে দুইয়ে, বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তিন দশমিক তিন থেকে এক দশমিক তিন, দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী মানুষের অনুপাত শতকরা সত্তর ভাগ (সাড়ে সাত কোটিতে সোয়া পাঁচ কোটি) থেকে নেমে শতকরা চব্বিশ (সাড়ে ষোলো কোটিতে চার কোটি), 'বাসকেট কেইস' থেকে উন্নয়ন বিস্ময়—নেক্সট ইলেভেন, ফ্রন্টিয়ার ফাইভ এবং থ্রিজি। তেতাল্লিশ বছরের এই কঠিন ও অনিশ্চিত পথচলায় টানেল শেষ হলেই আলোকবর্তিকা শুরু হলো কখন, কীভাবে, কোন দর্শনে, কোন প্রেক্ষিতে, কার অকুতোভয়, উদ্ভাবনী ও অবিসংবাদিত নেতৃত্বে তা জানতে হবে বৈকি!

প্রতিবছর আগস্ট এলেই শোকের মাতম হয়। শোককে শক্তিতে পরিণত করার শপথের প্রতিযোগিতা হয়। যারা গুনতির মধ্যে : বিশিষ্টজন, বিত্তবান, নীতিনির্ধারক, নীতি সমালোচক, বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত এবং রাষ্ট্র ও সমাজপতিগণ যদি প্রতিদিন 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়ার' ইস্পাত কঠিন শপথ বাক্যটি এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখাবয়ব স্মরণ করি তা হলে অনেক অন্যায়, অপচয়, শোষণ, বৈষম্য ও দুর্নীতি হ্রাস পেত নিঃসন্দেহে। বিগত কয়েক বছরে আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে অগ্রগতির যে শক্তিশালী ইতিবাচক ধারা চলমান হয়েছে তা আরো বেগবান হতে পারত। মহান স্বাধীনতা অর্জনের অর্থনৈতিক পটভূমি স্মরণ করিয়ে বর্তমান প্রজন্মের একাংশ যারা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছে তাদের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজি, টেন্ডার ছিনতাই, ছলে বলে কৌশলে আধিপত্য বিস্তার ও ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলে খুন-খারাবিতে লিপ্ত তাদের পথে এনে এবং আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দেশকে আরো মজবুত করতে প্রশাসনকে সাহায্য করা যাবে। এই নিবন্ধে জানা যাবে, কীভাবে সজ্ঞান ও সাহসিক অনুসন্ধানে বঙ্গবন্ধু হত্যার আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনে বজ্রকণ্ঠ উচ্চারণ আসবে। জানা যাবে ১৫ আগস্ট সরকারের সেনাপ্রধানের ভূমিকা কেন এমন ছিল।

বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু ও অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিতভাবেই এক ও অভিন্ন। সুতরাং বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পটভূমি, স্বাধীনতার স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন মহানায়ক হিসাবে গড়ে ওঠা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক মুক্তি কেন মুখ্য সে সব বিষয়ে খুব সংক্ষেপে অনেকটা রূপরেখার মতো করে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, অতীতে সুজলা, সুফলা, শস্য শ্যামলা বাংলার সমৃদ্ধি সর্বজনবিদিত ছিল। চীন পর্যটকরা, ইবনে বতুতা প্রমুখ এটি প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের ভ্রমণ কাহিনিতে এটার উল্লেখ করেন। মার্কেন্টিলিস্ট বহির্বাণিজ্য মাধ্যমে রাতারাতি ধনসম্পদ, বৈদেশিক মুদ্রা ও মূল্যবান হীরা জহরত (কোহিনূর মণিসহ), সোনাদানা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে ইউরোপীয় শক্তিসমূহ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলার দিকে লোলুপ দৃষ্টি ফেলে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্বুদ্ধিতা ও স্যার টমাস রো কর্তৃক অভিনীত ছল চাতুরীর ফলশ্রুতিতে ধূর্ত ইংরেজগণ ভারতবর্ষে আপাতদৃষ্টিতে 'নির্দোষ' বাণিজ্য করার অনুমতি পায়। আর তাই হয়ে ওঠে একশ নব্বই বছরের শোষণ ও লুণ্ঠনের ছাড়পত্র। কবিগুরুর ভাষায় 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'। ২৩ জুন ১৭৫৭ তারিখে মীরমদন, মোহন লালের অসাধারণ শৌর্য বীর্য এবং আত্মত্যাগ সত্ত্বেও মীরজাফরীয় বিশ্বাসঘাতকতায় স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল এই বাংলায় পলাশীর আম্রকাননে বেনিয়া ইংরেজদের কাছে। তারপর ড্যান্ডিতে তৈরি কাপড় আমাদের মসলিনের কাছে প্রতিযোগিতায় অক্ষম হওয়াতে মসলিন বস্ত্রবয়ন শিল্পীদের হাত কাটা ও নীল চাষিদের ওপর সীমাহীন অত্যাচারে সোনার বাংলা শ্মশান হয়ে গেল। পূর্ববাংলা তখন ব্যবহৃত হচ্ছিল পশ্চাতভূমি হিসাবে; এখনকার অধিবাসীরা শোষিত হতে হতে অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষ হয়ে যান। অবস্থা পরিবর্তনে বঙ্গভঙ্গ হলো ১৯০৫ সালে। অতঃপর বঙ্গভঙ্গ রদ ১৯১১ সালে। অনেকেরই মূল্যায়ন : ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বঙ্গভঙ্গরদের আংশিক ক্ষতিপূরণ তথা পশ্চাতপর পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে শিক্ষাকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়াসেই।

১৯৪০ সালে শেরেবাংলা উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস অব পাকিস্তান) পূর্ববাংলাসহ পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে বাঙালির উঠে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের পরবর্তী অধিবেশনে দিল্লিতে বেআইনিভাবে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে 'স্টেটস'কে 'স্টেট' বানিয়ে ভবিষ্যতের মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে বাংলাকে বাদ দেয়ার ষড়যন্ত্র করেন। সোহরাওয়ার্দী কিরণশংকর শরৎ বসুর গ্রেটার বেঙ্গল পরিকল্পনাও হালে পানি পেল না। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বাধীন কেবিনেট মিশন প্ল্যানেও কিন্তু তুলনামূলকভাবে দুর্বল কেন্দ্র শাসিত কনফেডারেশনে স্বায়ত্তশাসিত পূর্বাঞ্চলে বাংলার জনগণের নিজ ভাগ্য গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল। কেবিনেট মিশন প্ল্যান প্রত্যাখ্যাত হলো। একটি মজার ব্যাপার হলো, ১৯৩৫ সালে দ্য গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের অধীনে ১৯৪৬ সালে সারা ভারতবর্ষের প্রদেশগুলোতে যে নির্বাচন হয় তাতে বেঙ্গলই একমাত্র রাজ্য যেখানে স্বাধীনতার পক্ষে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ ভোট পড়ে। আর স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খানের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি 'কন্টিনিউয়েশন অব ব্রিটিশ রাজ'-এর পক্ষে ভোট দেয়। সুতরাং ১৯৪৭ সালের আগস্টে ব্রিটিশ শোষকদের বিদায় হলেও ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের মেকী পাকিস্তান রাষ্ট্রটির জন্ম হলো। কিন্তু প্রচণ্ড দাপটে সেই পাঞ্জাবিরাই সারা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববাংলার ওপর শাসন-শোষণের খড়্গ চাপিয়ে দিল। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানে ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলাকে মুক্ত করার মানসেই ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়। শেখ মুজিব প্রথমে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও ধীরে ধীরে বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে জনগণের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সংগ্রামে, সাহসে এবং সবশেষে সম্মোহনী শক্তিতে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ধর্মভীরু মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব একজন নিবেদিতপ্রাণ খাঁটি অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন; ১৯৫৩ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ সরবে আওয়ামী লীগে পরিণত হয়ে যৌথ নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করে তারই নেতৃত্ব ও প্রেরণায়। উল্লেখ্য যে, মুসলিম বাংলার অবাস্তব ও ভ্রান্ত ধারণা তখন যেমন ছিল, এখনও তা অনেককেই বিভ্রান্ত করছে।

ইতিহাস বলে, আওয়ামী লীগ একটি পশ্চিমা উদার শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী দল হিসাবেই পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের শুরুতে শক্তি ও প্রসার লাভ করতে থাকে। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ ভাগ হয়ে গেলে শেখ মুজিব সমাজতান্ত্রিক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে) না গিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে উদার গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় শাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃশ্যমান পথে নিয়ে যান শেখ মুজিব। ষাটের দশকের শেষার্ধে সাম্যবাদ, সমতা ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে সারা বিশ্বকে আলোড়িত করে প্রবল সমাজতান্ত্রিক ঢেউ সৃষ্টি হয়। তখন পর্যন্ত বাঙালির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মুক্তি আন্দোলনের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ ছাত্রলীগ এবং জনাব তাজউদ্দীন আহমদের প্রভাবে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে সমাজতান্ত্রিক ধারায় নিয়ে আসেন। একজন অকুতোভয় জাতীয়তাবাদী এবং শতভাগ গণতন্ত্রমনা শেখ মুজিব সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনেই সর্বজনীন রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি ইংরেজ উপনিবেশ ও পাকিস্তানি আধাউপনিবেশ কালের শোষণে নিঃস্ব বাঙালি জাতিকে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদ এনে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোনো রকম অত্যাচার, নির্যাতন, জেল-জুলুম শেখ মুজিবকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

শহর, বন্দর, নগর ছাপিয়ে গ্রামবাংলার কোটি মানুষ বাঁশের লাঠি সজ্জিত হয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করতে রাস্তায় নেমে পড়েন। কারণ নেতা তাদের শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন স্বাধীনতার। পৃথিবীর ইতিহাসে নেতার নির্দেশে এভাবে স্বাধীনতার লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নজির নেই

পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাভাস বলে গণ্য ১৯৬৬ সালের ৭ জুন শেখ মুজিব ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৬২ সাল থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন লালন করলেও শেখ মুজিব অগ্রসর হতে চান অতি সতর্কভাবে কেননা তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী অপবাদের দুর্নাম চাননি। এটি ছাড়াই তিনি স্বাধীনতা প্রত্যাশী ছিলেন। ছয় দফায় দুই প্রদেশে দুটি ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা এবং স্বাধীন বহির্বাণিজ্যের অধিকার পাকিস্তানিরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারত না। সেভাবেই তৈরি হলো ৭ মার্চ ১৯৭১ সালের প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার ঘোষণা 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। ইতোমধ্যে সর্বদলীয় ছাত্রজনতার এগারো দফা ও আওয়ামী লীগের ছয় দফার প্রচণ্ড শক্তিতে জেলের তালা ভেঙেই বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবকে মুক্ত করে 'বঙ্গবন্ধু' ভূষণে গণমানুষের মনের মুকুরে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ছয় দফা, এগারো দফা ও গণভ্যুত্থানের অপ্রতিরোধ্য শক্তি, গতি ও তীব্রতর চলমানতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয়ী হয়। তিনশ আসনের মধ্যে একশ সাতষট্টি আসনে বিজয়ী হয় ছয় দফা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি। সমালোচকরা অবশ্য থেমে থাকেননি। শেখ মুজিব আবারও সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার, এলএফওর অধীনে কেন নির্বাচনে গেলেন! তাদের কে বোঝাবে যে, ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট নীতিতে পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ বাঙালি নির্বাচনে বিজয়ী হবে এ বিষয়ে শেখ মুজিব নিশ্চিত ছিলেন। তাই 'দেব আর নেব' এ ভিত্তিতে এক মাথা এক ভোট ও লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। প্রত্যাশিতভাবেই বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হয় এং ততোধিক প্রত্যাশিতভাবেই একাত্তরের পহেলা মার্চ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি করা হয়।

দেশ বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সকল মত ও পথের লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকাতলে একত্রিত হয়। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে দেশ। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। অপরাধপ্রবণতা দূর হয়ে যায়। অস্থিরচিত্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার প্রস্তাব (!) নিয়ে ঢাকায় আসেন। যা হওয়ার তাই হয়। আলোচনা ভেঙে যায়। বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে স্বাধীনতার ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করেন। সামরিক শাসক গোষ্ঠী কিন্তু তাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করে শেখ মুজিবকে কারাগারে প্রেরণ করে। তবে বন্দী বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির রজ্জুতে মৃত্যুদণ্ড দিতে সাহস পায়নি। ইয়াহিয়া খানের তর্জনগর্জন, 'শেখ মুজিব'স ট্রিজন শ্যাল নট গো আনপানিশড' অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়। অশেষ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর শুভকামনায় বিশ্বজনমত পাকিস্তানি শাসককুলকে বাধ্য করে শেখ মুজিবকে সসম্মানে মুক্তি দিতে। বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ও স্থলসীমান্ত নির্ধারণের আলোচনার সূত্রপাত করেন বলেই অনেকে মনে করেন। তবে বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম ভূমি থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে তবেই ১০ জানুয়ারি বীর বেশে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন তিনি। সকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাকে জাতির জনক হিসাবেই স্বাগত জানালেন। শুরু হলো বাঙালির ভাগ্য বিবর্তনের পালা।

শোকের মাস। ৪০ বছর আগে ১৫ আগস্ট ভোরের আলো দিগন্তকে উদ্ভাসিত করার আগেই ইতিহাসের এক বর্বরতম হত্যাকাণ্ডে সপরিবারে হত্যা করা হলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। দৈব সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে রইলেন। বাংলাদেশের কৃষ্ণরজনীর দুই সপ্তাহ আগে ৩০ জুলাই ১৯৭৫ তারিখে স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী এম. এ. ওয়াজেদ মিয়ার গবেষণাস্থল জার্মানিতে চলে যান শেখ হাসিনা— সঙ্গে পুত্র, কন্যা ও ছোট বোন শেখ রেহানা। ১৫ আগস্ট তারা দেশে থাকলে আজকের দিনে বিশ্বের নজর কাড়া আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির যে গৌরব বাংলাদেশ অর্জন করে চলেছে তার হাল ধরার কেইবা থাকত। স্বাধীনতার আদর্শ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং দারিদ্র্য, অপুষ্টি, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যহীন সোনার বাংলা গড়ার রূপকার ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে নির্মম ও পৈশাচিকভাবে হত্যা করে সেই আদর্শ এবং জাতিকে যারা নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল তার বিচারই বা কোন সাহসে কে শুরু করতে পারতেন। বিচার হয়ে হন্তারকরা ক্রমে ক্রমে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলছে। জাতি আশা করছে সেই হন্তারকদের দায়মুক্তি দিয়ে করা অধ্যাদেশ এবং পরবর্তী সময় সংসদে সেই দায়মুক্তিকে আইনি বৈধতা যে দুজন দিয়েছিলেন, তাদেরও টোকেনভাবে হলেও মরণোত্তর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনীতি কীভাবে কেমন করে এবং কোন অগ্রাধিকারে গ্রথিত হয়েছিল তা স্মরণ করা যেতে পারে। রাজনীতিতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেখড়ি তার শৈশবে মধুমতি বিধৌত টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা নদী কিনারে গ্রামবাংলার মাঠে ময়দানে। দুটো জিনিস তার মন-মানসিকতায় অর্থনীতি সম্পর্কে রেখাপাত করে। প্রথমত তিনি দেখেছিলেন দারিদ্র্যের কদর্য কশাঘাতে মানুষ কীভাবে দুর্দশার চরম শিখরে পৌঁছে সর্বস্বান্ত হয়। দ্বিতীয়ত তিনি উপলব্ধি করেন যে পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা সায়রা খাতুন পরম মমতায় গরিব-দুঃখীর পাশে দাঁড়াতেন, অন্ন-বস্ত্রের সাহায্যের হাত প্রসারিত করতেন। তাই তো বস্ত্রহীন পথচারীকে গায়ের জামা খুলে দিয়ে এলেও এবং পিতার অনুপস্থিতিতে পারিবারিক গোলা থেকে ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত গরিব-দুঃখীকে ধান বিতরণ করে শেখ মুজিবকে পিতার সস্নেহ অনুমোদন পেতে কষ্ট হয়নি। এরপর ঘটনাবহুল দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি পদে বাধা-বিপত্তি প্রতিক্রিয়ার জাল ছিন্ন করে ১৯৬২ সাল থেকে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তা। দুঃখী বাঙালির অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের কৃতসংকল্প ভাবনাই দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন শেখ মুজিব। শহর, বন্দর, নগর ছাপিয়ে গ্রামবাংলার কোটি মানুষ বাঁশের লাঠি সজ্জিত হয়ে খান সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করতে রাস্তায় নেমে পড়েন। কারণ নেতা তাদের শেখ মুজিব ডাক দিয়েছেন স্বাধীনতার। পৃথিবীর ইতিহাসে নেতার নির্দেশে এভাবে স্বাধীনতার লড়াই করতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নজির নেই। শহীদানের রক্তগঙ্গায় বহু সাগর পেরিয়ে বহুমূল্যে এলো স্বাধীনতা। (চলবে)

● **লেখক : অর্থনীতিবিদ ও সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক**